সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

মীর মশাররফ হোসেনের নাটক : একটি সমীক্ষা

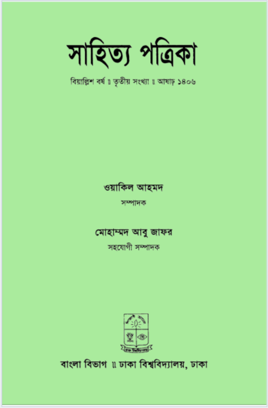

Vol. 42 | No. 3 | 1999

Check for updates

Volume	42
Issue	3
Year	1999
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	আবুল আহসান চৌধুরী
Published online	June 1, 1999
DOI	10.62328/sp.v42i3.3
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v42i3.3
Pages	55-74
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

মীর মশাররফ হোসেনের নাটক : একটি সমীক্ষা

আবুল আহসান চৌধুরী*

মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১১) বাংলা সাহিত্যের এক স্মরণীয় শিল্পস্রষ্টা। তাঁর মাধ্যমেই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে বাঙালি মুসলমানের যোগসূত্র রচিত হয়। প্রকৃতপক্ষে, উনিশ শতকে সমাজ-প্রগতির মূল স্রোতোধারা থেকে বিচ্ছিন্ন বাঙালি মুসলমানের ভাষাগত সংস্কার, দোভাষি পুথির রুচি, জাতিগত স্বাতন্ত্র্য-চিন্তা ও জাতীয়তা সম্পর্কে ভ্রান্তধারণার বৃত্ত ভেঙে বেরিয়ে আসা প্রথম সার্থক মুসলমান সাহিত্যশিল্পী।[১]

মশাররফ হোসেন সব্যসাচী লেখক। সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য প্রায় সব ক'টি শাখাতেই তাঁর ছিলো স্বচ্ছন্দ বিচরণ। বাংলা নাটক-প্রহসনের ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান বিশেষ স্মরণীয়। এক-অর্থে তিনিই প্রথম মুসলিম নাট্যকার।[২]

মশাররফের নাট্যচর্চার মূলে তাঁর সাহিত্যগুরু 'কাঙাল হরিনাথ মজুমদারের (১৮৩৩-১৮৯৬) প্রভাব-প্রেরণার কথা অনুমান করা চলে। হরিনাথের নাটক-উপাখ্যান, নাটকের নান্দী-প্রস্তাবনা কিংবা তাঁর রচিত নাটকের গ্রামীণ মঞ্চায়ন - এই বিষয়গুলো মশাররফকে কোনো না কোনোভাবে প্রভাবিত করে থাকবে। 'বসন্তকুমারী'র কাহিনী পরিকল্পনায় 'বিজয়-বসন্তে'র পরোক্ষ প্রভাব,

---

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

১. বাংলা সাহিত্যে মশাররফের আবির্ভাবের তাৎপর্য সম্পর্কে ওয়াকিল আহমদ বলেছেন, "বাংলার মুসলমান সমাজের দীর্ঘ অর্ধ-শতাব্দীর শীতল ও স্থবির নীরবতা দূরীভূত হয়ে আধুনিক ধারায় ও রীতিতে সাহিত্যচর্চার দ্বারোদ্‌ঘাটন হল মশাররফ হোসেনের শিল্পকর্মের মাধ্যমেই। একটি সুপ্তিমগ্ন, ভগ্নদশাপ্রাপ্ত, ভ্রান্তপথগামী জাতির জীবনে প্রথম সম্বিত এনে দিলেন তিনি।"– 'উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা', ১ম খণ্ড, ঢাকা, ১৩৯০ : পৃ. ২৬১

২. মশাররফের পূর্বে মুন্সী নামদার, গোলাম হোসেন, সেখ আজিমদ্দী প্রমুখের রচনার মাধ্যমে বাংলা নাটকে মুসলমান নাট্য প্রয়াসের সন্ধান মেলে। এঁদের ক্ষুদ্রকায় নক্‌শাধর্মী প্রহসনের প্রকাশকাল ১৮৬৩ থেকে ১৮৬৮ সালের মধে। এঁদের রচনা কেবল সাহিত্যের ইতিহাসে কালক্রমের জন্যই উল্লেখ্য, নচেৎ শিল্পগুণে এই প্রহসনগুলো নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর,– সমালোচকদের এই অভিমত অযথার্থ নয়।

'বসন্তকুমারী' কিংবা 'জমিদার দর্পণে' 'সাবিত্রী নাটিকা'র নান্দী-প্রস্তাবনার সাদৃশ্য এবং হরিনাথের মতো মশাররফেরও স্ব-উদ্যোগে স্বরচিত নাটক গ্রামে অভিনয়ের ব্যবস্থার কথা এ-ক্ষেত্রে স্মরণ করা যেতে পারে। মশাররফের নাট্যমানসে মধুসূদন (১৮২৪-১৮৭৩) ও দীনবন্ধু মিত্রের (১৮৩০-১৮৭৩) প্রভাব ও প্রেরণার স্বাক্ষর অত্যন্ত স্পষ্ট।

মশাররফ নাটক রচনার পাশাপাশি মঞ্চায়নের বিষয়েও উদ্‌যোগী হয়েছিলেন। এ-থেকে তাঁর নাট্যচিন্তা ও নাট্যচর্চার স্বরূপ কিছুটা বোঝা যায়। বাংলা পেশাদার রঙ্গালয়ের সেই শৈশবলগ্নে মশাররফের প্রয়াস ও প্রযত্নে প্রত্যন্ত পল্লীতেও নাটক মঞ্চায়নের ব্যবস্থা হয়। এ-বিষয়ে তাঁর অপ্রকাশিত আত্মজীবনীতে তিনি উল্লেখ করেছেন :

> যে সময় আমি নাটক অভিনয় করিয়াছি, গ্রাম দূরে থাকুক সে সময় মহানগরী কলিকাতায় ব্যবসাদার নাট্যকারগণ রঙ্গমঞ্চে কেহই দেখা দেন নাই। কয়েক বৎসর পর নেসানাল থিয়েটার নামে এক নাট্যমন্দীর স্থাপিত হয়। তাহার পরেই বেঙ্গল থিয়েটার আসরে অবতীর্ণ হন।[৩]

মশাররফ নানা বিষয় নিয়ে বেশ কয়েকটি নাটক-প্রহসন রচনা করেন। এই নাট্যপ্রয়াস তাঁর সাহিত্যখ্যাতি ও পরিচিতির পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়। প্রকাশক্রম অনুসারে মশাররফ হোসেনের নাটক-প্রহসনের তালিকা নিম্নরূপ :

১. বসন্তকুমারী নাটক (১২৭৯ / ১৮৭৩)

২. জমীদার দর্পণ (১২৭৯ / ১৮৭৩)

৩. এর উপায় কি? (১৮৭৫)

৪. বেহুলা গীতাভিনয় (১২৯৬ / ১৮৮৯)

৫. টালা-অভিনয় (১৮৯৭)

এ-ছাড়াও 'ভাই ভাই এই ত চাই', 'ফাঁস কাগজ', 'একি?' নামে তাঁর কয়েকটি প্রহসনের নাম বিজ্ঞাপিত হয়েছিল।[৪] তবে এই বইগুলোর প্রকাশ সম্পর্কে নিঃসংশয় হওয়া যায়নি।[৫]

---

৩. মীর মশাররফ হোসেনের অপ্রকাশিত আত্মজীবনী, পৃ. ১২৮। আবুল আহসান চৌধুরীর 'মীর মশাররফ হোসেন : সাহিত্যকর্ম ও সমাজচিন্তা' (ঢাকা, ১৪০৩, পৃ. ৯৬) গ্রন্থে উদ্ধৃত।

৪. 'গাজী মিঁয়ার বস্তানী' (১৩০৬ / ১৮৯৯) পুস্তকের পরিশিষ্টের বিজ্ঞাপন দ্রষ্টব্য।

৫. 'বিবি কুলসুম' (১৯১০) গ্রন্থের পরিশিষ্টে সংযোজিত বিজ্ঞাপনে এই তিনটি গ্রন্থসহ আটটি গ্রন্থ 'শেষ হইয়া গিয়াছে' বলে মন্তব্য করা হয়। এর ফলে কিছুটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। তবে

২.

'বসন্তকুমারী নাটক' (১৮৭৩) মশাররফ হোসেনের নাট্যকর্মের প্রথম নিদর্শন। লেখকের ভূমিকা থেকে জানা যায়, মশাররফ এই নাটক রচনার প্রেরণা পান তাঁর 'অকপট প্রিয় মিত্র সাহিত্যানুরাগী' ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মৌলবী বজলাল করিমের নিকট থেকে। প্রথম নাট্যপ্রয়াস যে ত্রুটিহীন নয় সে-কথা সবিনয়ে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হননি তিনি। 'বসন্তকুমারী' উৎসর্গিত হয় বঙ্গদেশের মুসলিম সমাজের নেতৃপুরুষ নবাব আবদুল লতিফকে। 'এডুকেশন গেজেট' (১১ শ্রাবণ ১২৮০)-সূত্রে জানা যায়, রচনার পাঁচ-ছয় মাস পর 'বসন্তকুমারী' নাটকটি লাহিনীপাড়ায় মশাররফের বাসভবনে অভিনীত হয়।[৬]

'বসন্তকুমারী' রাজকীয় আবহে রচিত একটি মানবিক ট্রাজেডির কাহিনী। যথার্থই "এ নাটক মানব মনের অনুভূতি এবং হৃদয়ের আবেগের আলোড়নের চিত্র।"[৭] সংক্ষেপে এখানে নাটকটির কাহিনী পরিবেশিত হলো।

বীরেন্দ্র সিংহ ইন্দ্রপুরের রাজা। তিনি বিপত্নীক। তাঁর ইচ্ছা, যুবরাজ নরেন্দ্রের বিবাহ প্রদান করে সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন। কিন্তু বিদূষক প্রিয়ম্বদের প্ররোচনায় যুবরাজের বিবাহ বিলম্বিত করে রাজা স্বয়ং বৃদ্ধাবস্থায় রেবতী নাম্নী এক সুন্দরী তরুণীর পাণিগ্রহণ করেন। রাজার এই 'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা'-গ্রহণ রাজ্যে বিশেষ নিন্দা-সমালোচনা ও হাস্য-পরিহাসের অবতারণা করে।

নতুন রানী রেবতী শিথিল চরিত্রের রমণী। সে সুদর্শন যুবরাজ নরেন্দ্রের প্রতি প্রণয়াসক্ত হয়। প্রথমে দূতী দাসী ও পরে পত্রের মাধ্যমে রানী প্রণয় প্রস্তাব পেশ করে। কিন্তু এই সম্পর্কের শৃঙ্খলা বিনষ্টকারী অনৈতিক প্রণয়-নিবেদন নরেন্দ্র প্রত্যাখ্যান করে।

এদিকে ভোজপুরের রাজা বিজয় সিংহের কন্যা বসন্তকুমারী স্বপ্নে যুবরাজ নরেন্দ্রকে দর্শন করে তাকে লাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। উৎকণ্ঠিত রাজা সকল বৃত্তান্ত অবহিত হয়ে স্বয়ম্বর-সভার ব্যবস্থা করে। বসন্তকুমারীর চিত্রপট

মশাররফ অনেক সময় যন্ত্রস্থ কিংবা প্রকাশিতব্য, এমন কী পরিকল্পিত বইয়ের নামও বিজ্ঞাপনে দিতেন। এ-সম্পর্কে বিবি কুলসুম মাঝে-মধ্যেই তাগাদা দিয়ে বলতেন, "ঐ বিষয়টি লিখিতে চাহিয়াছিলে, কৈ লিখিলে না।" "ঐ প্রবন্ধটার এক পাত লিখিয়া ফেলিয়া রাখিলে কেন?" * * * "নাম রাখিলে বিজ্ঞাপন দিলে, পুস্তকের খোঁজ নাই।" ('বিবি কুলসুম', কলকাতা, ১৩১৬, পৃ. ১১১)

৬. আবদুল লতিফ চৌধুরী, *মীর মশাররফ হোসেন*, সিলেট, ১৯৬২, পৃ. ৬

৭. মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল, *মীর মশাররফের গদ্যরচনা*, ঢাকা, ১৩৮২, পৃ. ৪২

দর্শনে তার প্রতি আকৃষ্ট নরেন্দ্রও আমন্ত্রিত হয়ে স্বয়ম্বর-সভায় উপস্থিত হয়। শেষ পর্যন্ত বসন্তকুমারী তার আকাঙ্ক্ষিত জনকেই পতিত্বে বরণ করে।

রানী রেবতী তার কুবাসনা চরিতার্থ করতে না পেরে নরেন্দ্রকে জব্দ করার ফন্দি আঁটতে থাকে। নরেন্দ্রের বিবাহ তাকে আরো বেশি ঈর্ষান্বিত ও প্রতিহিংসাপরায়ণ করে তোলে। রাজার কাছে রানী রেবতী তার সতীত্বনাশ-চেষ্টার মিথ্যা অভিযোগ আনে নরেন্দ্রের বিরুদ্ধে। স্ত্রৈণ রাজা রেবতীর এই কপটতা ও ষড়যন্ত্রের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। রানীর ইচ্ছানুসারে রাজা বীরেন্দ্র যুবরাজকে অগ্নিকুণ্ডে আত্মবিসর্জন দণ্ড প্রদান করেন। নির্দোষ যুবরাজ পিতৃ-নির্দেশ মান্য করে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করে এবং নব-পরিণীতা পত্নী বসন্তকুমারীও তার অনুগামিনী হয়।

যুবরাজের সস্ত্রীক আত্মবিসর্জনের পরপরই রাজা বীরেন্দ্র যুবরাজকে লিখিত রেবতীর প্রণয়-পত্র পাঠ করে সমুদয় বিষয় অবহিত হন। রাজা তৎক্ষণাৎ পাপিষ্ঠা রানীকে হত্যা করেন। অনুশোচনা ও আত্মগ্লানিতে জর্জরিত, নির্দোষ পুত্র ও পুত্রবধূর মৃত্যুতে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত রাজা বীরেন্দ্র ও নিজের ভ্রান্তির প্রায়শ্চিত্তের জন্য জ্বলন্ত অগ্নিতে আত্মাহুতি দেন। 'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা'ই যে এই মর্মান্তিক পরিণতরি মূল কারণ, এই কাহিনী তা-ই নির্দেশ করে।

'বসন্তকুমারী নাটকে'র কাহিনী-উৎস সম্পর্কে স্পষ্ট কিছু জানা যায় না। যোগেন্দ্র চন্দ্র গুপ্তের 'কীর্ত্তিবিলাসে'র (১৮৫১) সঙ্গে এর কাহিনীগত সাদৃশ্য আছে। তবে বাংলার লৌকিক কাহিনীতেও এই ধারার গল্প-কথার সন্ধান মেলে। কেউ কেউ তাই ধারণা করেছেন, কাহিনীর জন্য মশাররফ প্রচলিত লোককাহিনীর কাছেই ঋণী, যোগেন্দ্র চন্দ্রের কাছে নন। উভয়ের কাহিনী-পরিকল্পনার উৎস অভিন্ন।[৮]

সমালোচক মুনীর চৌধুরী 'কীর্ত্তিবিলাস' ও ফরাসি নাটক 'Phaedra'-এর সঙ্গে 'বসন্তকুমারী নাটক'-এর তুলনামূলক আলোচনায় যে মন্তব্য করেছেন, তা প্রণিধানযোগ্য : "যা জি. সি. গুপ্তে নেই, তা হল 'বসন্তকুমারী'র কাহিনী-গ্রন্থনের সুসংবদ্ধতা, সংলাপের বিচিত্র চাতুরী এবং এক সর্বাঙ্গীন প্রাণবন্ত ভাবপরিমণ্ডল। যা 'বসন্তকুমারী'তে নেই, তা আছে ফরাসী নাট্যকার রাসিনের Phaedra তে-যেখানে সপত্নীপুত্র Hyppolytus-এর প্রতি স্মরাহত হয়ে রানী

৮. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৭৪, তৃ-স, পৃ. ৪১০

তার ক্ষতাক্ত হৃদয়ের শোণিত দিয়ে গড়ে তুলেছে সংলাপের উত্তাপকে, তার অপমানিত প্রত্যাখ্যাত হৃদয়ের রোষস্ফুলিঙ্গ দিয়ে করে তুলেছে সে ভাষাকে প্রদীপ্ত, শাণিত।"[৯] মাতা-পুত্রের সম্পর্কের পবিত্রতা বিনষ্টের আর-একটি উদাহরণ সফোক্লিসের 'ইতিহাস' নাটক। কিন্তু মশাররফ এইসব নাট্যকর্মের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, এমন প্রমাণ মেলেনি।

'বসন্তকুমারী নাটক'টি তিন অঙ্কে বিভক্ত। প্রথম সংস্করণে দৃশ্য-সংখ্যা ছিলো এগারো। দ্বিতীয় সংস্করণে অতিরিক্ত একটি দৃশ্য সংযোজিত হয়। অতঃপর চূড়ান্ত দৃশ্য-বিন্যাস দাঁড়ায় এইরকম : প্রথম অঙ্কে পাঁচ, দ্বিতীয় অঙ্কে চার ও তৃতীয় অঙ্কে তিনটি দৃশ্য। মশাররফ দৃশ্যকে চিহ্নিত করেছেন 'রঙ্গভূমি" নামে। এই নাটকে একটি গান, একটি পদবন্ধ প্রণয়লিপি ও একটি অমিত্রাক্ষর পদ্যস্তুতি স্থান পেয়েছে। 'বসন্তকুমারী নাটক'টি সংস্কৃত রীতি-প্রভাবিত। নাটকের ভূমিকাস্বরূপ 'প্রস্তাবনা' অংশ সংযোজন এবং সূত্রধারের মাধ্যমে নাট্য-বিষয় সম্পর্কে ইঙ্গিত-দান, সংস্কৃত নাটকের রীতি-পদ্ধতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মশাররফ 'বসন্তকুমারী নাটকে'র 'প্রস্তাবনা'য় সূত্রধাররূপী নট-নটীর কথোপকথনে একটি অবাঞ্ছিত ও অপ্রীতিকর সমকালীন সামাজিক সমস্যার কথা তুলে ধরেছেন, তা হলো 'মুসলমান লেখকের প্রতি হিন্দুসমাজের অবজ্ঞার পরিচয়'।[১০]

কাহিনীর অনুষঙ্গে 'বসন্তকুমারী নাটকে'র প্রধান চরিত্রগুলো রাজকীয় আবহে লালিত। কাহিনীর প্রয়োজনে ঠিক নয়, অনেকটা যেনো প্রক্ষিপ্তরূপে দু-একটি প্রাকৃত চরিত্রের সাক্ষাৎ মেলে। পুরুষ-চরিত্রের মধ্যে বীরেন্দ্র সিংহ ও রাজকুমার নরেন্দ্র সিংহই প্রধান। উল্লেখযোগ্য নারীচরিত্র দুটি - রেবতী ও বসন্তকুমারী। নাম-চরিত্র বসন্তকুমারী অপেক্ষা রেবতী এই নাটকে জীবন্ত, বিকশিত ও উজ্জ্বল চরিত্র। এক অর্থে সে-ই 'এই নাটকের প্রাণ'। তার আচরণ ও ক্রিয়াকাণ্ড নাটকের কাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ এবং বিপর্যয়-পরিণতিকে ত্বরান্বিত ও নিশ্চিত করেছে। অপ্রধান চরিত্রের মধ্যে বিদূষক প্রিয়ম্বদ ও মালতীর কথার বিশেষ উল্লেখ করতে হয়। এই নাটকে নিম্নশ্রেণীর দু-একটি চরিত্র খুব সংক্ষিপ্ত পরিসরেও প্রাণবন্ত রূপ নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। বক্তব্য ও সংলাপে এদের

৯. মুনীর চৌধুরী *মীর -মানস*, ঢাকা, ১৩৭৫, দ্বি-মু, পৃ. ৩৯

১০. কাজী আবদুল মান্নান সম্পাদিত, *মশাররফ রচনা-সম্ভার*, ১ম খণ্ড। ঢাকা, ১৩৮৩, পৃ. ১১ (গ্রন্থ-প্রসঙ্গ)

অবস্থান মাটির খুব কাছাকাছি। প্রথম অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যটি সাধারণ মানুষের চিন্তা-চেতনা-উপলব্ধির পরিচয় বহন করে। সুরমা ও বিমলা নাম্নী দুই গ্রাম্য রমণীর আলাপচারিতায় তাদের বৈশিষ্ট্য চমৎকার প্রকাশিত হয়েছে। এদের বাগ্-বৈদগ্ধ্য উল্লেখ করার মতো। যেমন, বৃদ্ধ রাজার তরুণী ভার্যা গ্রহণের ঔচিত্য সম্পর্কে সরমা যখন বলে, 'রাজার তো চোক্ ছিল', তখন বিমলা জবাব দেয়–'চোক্ থাকলে কি হবে? মন যে এখনও হামাগুড়ি দেয়'। পাশাপাশি দুজন প্রজার কথাবার্তার ভেতরে তাদের দিনযাপনের গ্লানি ও 'মেয়েমানুষের গোলাম' হিসেবে চিহ্নিত অবিবেচক রাজার প্রতি তাদের তীব্র ধিক্কার প্রকাশিত। উচ্চ অভিজাত শ্রেণীর চরিত্রের তুলনায় এইসব সাধারণ গ্রাম্য পুরুষ-রমণীর চরিত্র সেখানে অধিক উজ্জ্বলতা নিয়ে উপস্থিত। নাটকটির কলেবর ক্ষীণ হওয়ায় অত্যন্ত দ্রুত কাহিনীর পট-পরিবর্তন হয়েছে। তাই, চরিত্রগুলোর যথাযথ বিকাশ হয়নি। অনেক সময় তারা আভাসেই মিলিয়ে গেছে। দু-একটি ব্যতীত অবশিষ্ট সব চরিত্রই অসম্পূর্ণ ও অবিকশিত।

মশাররফের ভাষা-প্রসঙ্গে তাঁর নাটক-প্রহসনের পর্যালোচনা গুরুত্বপূর্ণ। এ-বিষয়ে তাঁর 'বসন্তকুমারী নাটক' বিশেষ বিবেচনার দাবি রাখে। এই নাটকের সংলাপে কথ্যভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। তবে পরিবেশ, প্রসঙ্গ ও চরিত্রের গুরুত্ব ও মর্যাদা-অনুসারে সেই ভাষারও তারতম্য ঘটেছে। যেমন রাজা, যুবরাজ বা মন্ত্রীর সংলাপের ভাষা মার্জিত ও সাধু-ঘেঁষা। অন্তঃপুরবাসিনী রানী বা দাসীর ভাষা সেই তুলনায় সামান্য সরল ও ঘরোয়া এবং গ্রাম্য রমণী বা প্রজার কথোপকথনে আটপৌরে কথ্যভাষার পরিচয় মেলে। তবে 'বসন্তকুমারী'তে কথ্য ভাষারীতি ব্যবহৃত হলেও, ক্রিয়াপদে মাঝে-মধ্যে সাধু-চলিতের মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। আবার সম্বোধনের ঐক্যও সর্বত্র রক্ষিত হয়নি। এই অসঙ্গতি মশাররফের অমনোযোগেরই ফল।

'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা'–এই আপ্তবাক্যের সারত্ব প্রতিপন্নের জন্যই এই কাহিনীর অবতারণা। তাই পূর্ব থেকেই এর পরিণতি অনেকটাই নির্ধারিত। কাহিনীর বিস্তার, চরিত্রের বিকাশ কিংবা নাটকীয় দ্বন্দ্ব এখানে যথাযথভাবে পরিচর্যা-লাভে সক্ষম হয়নি। অনেকক্ষেত্রে দীর্ঘ সংলাপ 'বসন্তকুমারী'র নাট্যিক গুণ ক্ষুণ্ন করেছে। শেষ দৃশ্যের একাধিক মৃত্যু নাটকের ট্রাজিক আবেদনকে লঘু করে দিয়েছে।[১১]

---

১১. এস. এম. আবদুল লতিফ, *গদ্যশিল্পী মীর মশাররফ হোসেন*, রাজশাহী, ১৪০২, পৃ. ৫৫

সতর্ক পর্যবেক্ষণে এই নাটকের দুটি বিষয় ধরা পড়ে : এক. যৌবনের উন্মেষকালে পঠিত 'কাদম্বরী' গ্রন্থটি মশাররফের লেখক-জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। 'বসন্তকুমারী নাটকে'ও এই 'কাদম্বরী' গ্রন্থের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। দুই. এই নাটকের প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে বিরহকাতরা বসন্তকুমারীর মনোবেদনার সঙ্গে উত্তরকালে রচিত 'বিষাদ-সিন্ধু'র প্রণয়-পীড়িত এজিদের মনোবেদনার কিছু সাদৃশ্য আছে। ব্যাকুল জনকের উৎকণ্ঠার সম্মুখে বসন্তকুমারীর আচরণের সঙ্গে পিতার সম্মুখে প্রেমপীড়িত এজিদের আচরণের মিল সতর্ক পাঠকের চোখ এড়িয়ে যায় না।

প্রথম নাট্যরচনার দুর্বলতা ও ত্রুটি এখানে অস্পষ্ট নয়, তবুও 'বসন্তকুমারী'র কাহিনীর সাদৃশ্যযুক্ত 'কীর্তিবিলাস' নাটকের তুলনায় এর সাফল্য যে অধিক সে-সম্পর্কে স্পষ্ট রায় দিয়েছেন মুনীর চৌধুরী।[১২] মধুসূদন-দীনবন্ধুর নাট্যাদর্শ মীরের পরবর্তী নাটক-প্রহসনে ছায়া ফেললেও, 'বসন্তকুমারী'তে মশাররফ যে শিল্প-সামর্থ্যের পরিচয় দিয়েছেন তা উপেক্ষণীয় নয়।

৩.

উনিশ শতকে সমাজচিত্রপ্রধান 'দর্পণ'-নাটক রচনার একটি বিশেষ প্রবণতা দেখা দিয়েছিল। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' (১৮৬০) এ-ধারার প্রথম নাটক। এরপর ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হয় অজ্ঞাত নাট্যকারের 'সাক্ষাৎ দর্পণ' (১৮৭১), প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের পল্লীগ্রাম দর্পণ' (১৮৭৩), মশাররফ হোসেনের 'জমীদার দর্পণ' (১৮৭৩), যোগেন্দ্র নাথ ঘোষের 'কেরানী দর্পণ' (১৮৭৪), দক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের 'জেলদর্পণ' (১৮৭৫) ও ও 'চা-কর দর্পণ' (১৮৭৫)। এরমধ্যে প্রসঙ্গ ও প্রকরণগত দিক দিয়ে 'নীলদর্পণ' নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ। দর্পণ-নাট্যধারায় এরপরেই নাম করতে হয় 'জমীদার দর্পণ' নাটকের।

'জমীদার দর্পণ' মশাররফের দ্বিতীয় নাট্যপ্রয়াস। তাঁর খ্যাতির মূলে এই শিল্পকর্মটির বিশেষ অবদান আছে। নাটকটি মশাররফের জ্ঞাতিভ্রাতা পদমদীর নবাব মীর মোহাম্মদ আলীকে উৎসর্গিত। সমাজ-সম্পৃক্ত এই নাটকটি মশাররফের গুরুত্বপূর্ণ শিল্পকর্ম হিসেবে বিবেচিত। নামকরণ, ঘটনাবিন্যাস ও অভিপ্রায়গত দিক দিয়ে এই নাটক 'নীলদর্পণ' দ্বারা প্রভাবিত বলে কেউ কেউ

---

১২. মুনীর চৌধুরী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৯

মনে করেন।[১৩] তবে শিল্পগত তুলনায় 'নীলদর্পণ'-এর শ্রেষ্ঠত্ব যে স্বীকৃত তা বলাই বাহুল্য।

মশাররফ নিজে ছিলেন জমিদার পরিবারের সন্তান, তাঁর প্রধান আত্মীয়বর্গ প্রায় সকলেই জমিদার, জীবিকা-সূত্রে তিনি ছিলেন জমিদারি এস্টেটের কর্মাধ্যক্ষ। জমিদারি-প্রথার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পৃক্ততার কারণে এই সম্প্রদায়ের সদর-অন্দরের কোনো কথা ও কাহিনী তাঁর অবিদিত ছিলো না। লোক-হিতৈষণার প্রেরণায় তিনি জমিদারের অন্যায়-অত্যাচার-অবিচারের কথা তুলে ধরতে কুণ্ঠিত হননি। এক নির্মোহ শৈল্পিক দৃষ্টি ও প্রবল সামাজিক কর্তব্যবোধ থেকে তিনি রচনা করেন 'জমীদার দর্পণ' নাটক। জমিদারের লাম্পট্যদোষ, শোষণ-কৌশল, প্রজা-পীড়ন ও অর্থের প্রভাবে বিচার-ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ - এই হলো 'জমীদার দর্পণে'র মূল উপজীব্য।

'জমীদার দর্পণ' নাটকের পট উন্মোচিত হয়েছে কোশলপুর গ্রামে। হায়ওয়ান আলী এই কোশলপুরের জমিদার। তার লাম্পট্যের কথা সুবিদিত। নারীলোলুপ এই জমিদার গ্রামের এক নিরীহ দরিদ্র কৃষক আবু মোল্লার সুন্দরী যুবতী স্ত্রী নূরুন্নেহারের প্রতি আকৃষ্ট হয়। কিন্তু পতিব্রতা নূরুন্নেহার জমিদারের কু-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। অতঃপর জমিদারের নির্দেশে নূরুন্নেহারকে করায়ত্ত করার কৌশল হিসেবে তার স্বামী আবু মোল্লাকে ধরে আনা হয়। কিন্তু এতেও যখন নূরুন্নেহার জমিদারের ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকৃতি জানায়, তখন তাকে বলপূর্বক পেয়াদারা ধরে আনে হায়ওয়ান আলীর কাছে। অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধূ নূরুন্নেহারের উপর পাশবিক অত্যাচারের ফলে তার মৃত্যু হয়। এদিকে মুক্তি পেয়ে আবু মোল্লা তার নিহত স্ত্রী নূরুন্নেহারের মৃতদেহ আবিষ্কার করে ভদ্রাসনের নিকটস্থ এক বাগানে। মামলা রুজু হওয়ার পর এলো বিচারের পালা। বিচারের নামে শুরু হয় প্রহসন। আর্থিক মূল্যে হায়ওয়ান আলী বিচার ক্রয় করে। সাক্ষী ও ময়নাতদন্তকারী ডাক্তারের মিথ্যাভাষণ এবং স্বয়ং বিচারকের পক্ষপাতিত্বে হায়ওয়ান আলী বেকসুর খালাস পায়। এরপর শেষ দৃশ্যে আবু মোল্লা তার ক্ষণিক উপস্থিতির মাধ্যমে জানায় যে, মামলায় জয়লাভের পর হায়ওয়ান আলী তার ঘরবাড়ি ভেঙে তাকে গ্রাম থেকে বিতাড়িত করেছে। এখানেই কাহিনীর সমাপ্তি।

---

১৩. আনিসুজ্জামান, *মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য*, ঢাকা, ১৩৭১, পৃ. ২২৬

'জমীদার দর্পণ' নাটকটি যে সত্য ঘটনা অবলম্বনে রচিত সে-সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া গেছে। নাটকের প্রস্তাবনায় সূত্রধার উল্লেখ করেছে, "'জমীদার দর্পণ' যে নক্সাটি এঁকেছে তার কিছুই সাজানো নয়, অবিকল ছবি তুলেছে।" 'জমীদার দর্পণে'র সমালোচনা প্রসঙ্গে 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকাতেও এই কাহিনীর সত্যতা সম্পর্কে ইঙ্গিত করা হয়।[১৪] মশাররফ স্বয়ং তাঁর অপ্রকাশিত আত্মজীবনীতে এ-বিষয়ে উল্লেখ করেছেন :

> জমিদার দর্পণ হাতে লিখিয়া আমার বাটীতে কুমারখালীতে কয়েকবার অভিনয় করা হয়। শেষ অভিনয় দিনে আনার মোল্লাকে ['এই মোল্লার স্ত্রীই জমিদারের অত্যাচারে প্রাণ হারাইয়াছিল'– পাদটীকা] উপস্থিৎ করিয়া দর্শকগণকে দেখান হইয়াছিল। সত্য ঘটনামূলক নাটক অভিনয় সময় নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ সকলেই জীবিত।[১৫]

বাস্তব প্রেক্ষাপটে নাটকটি রচিত বলে মহলবিশেষ সঙ্গত কারণেই রুষ্ট হয়। নাটকের 'উপহার'-পত্রে মশাররফ এ-বিষয়ে ইঙ্গিতও দিয়েছেন এই বলে, 'অনেক শত্রু দর্পণখানি ভগ্ন করিতে প্রস্তুত হইতেছে।'

'জমীদার দর্পণ' তিন অঙ্কের ক্ষুদ্রায়তন নাটক। প্রতিটি অঙ্কে তিনটি করে দৃশ্য সংযোজিত। এখানে দৃশ্য অর্থে 'গর্ভাঙ্ক' ব্যবহৃত হয়েছে 'বসন্তকুমারী নাটকে'র মতো 'জমীদার দর্পণে'ও সংস্কৃত নাট্যরীতির অনুসরণে সূত্রধার ও নট-নটীর সহায়তায়। নাটকের বক্তব্য-বিষয় সম্পর্কে আভাস-দানের জন্য 'প্রস্তাবনা'- অংশটি পরিকল্পিত। নাটকে একটি পদবন্ধ প্রস্তাবনা ও একটি শোকোচ্ছ্বাস এবং দশটি গান সংযুক্ত হয়েছে। মূলত এই পদবন্ধ রচনা ও গান মূল কাহিনীর প্রবেশক এবং ঘটনাপ্রবাহের সংযোজক। কাহিনীর গতি-সঞ্চার

---

১৪. 'সোমপ্রকাশ' (৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৮০ / ১৯ মে ১৮৭৩, পৃ. ৪২৩-২৪) পত্রিকায় বলা হয়,–"যাঁহারা কলিকাতা অথবা তাহার সন্নিকটে বাস করেন তাঁহারা মনে করিতে পারেন গল্পটি অত্যুক্তি দোষে দূষিত। কিন্তু আমরা তাহা মনে করিনা, আমরা দূর মফস্বলস্থ কোন কোন জমীদারের চরিত বৃত্তান্ত বিশেষরূপে অবগত আছি, তাহাতে কোন রূপেই আমাদিগের এরূপ বোধ হইতেছে না যে গল্পটাতে অত্যুক্তি দোষের গল্প আছে। গ্রন্থকার..... দূর মফস্বলে বাস করিয়া থাকেন, অতএব মফস্বলের জমীদারেরা যে সকল কাণ্ড করেন তাহা তাঁহার অবিদিত নয়, হয়ত এরূপ ঘটনা হইয়াছে, তাঁহার অন্যতম জাতি যে অত্যাচার করিয়াছেন, তিনি স্বচক্ষে দেখিয়া তাহার বর্ণনা করিয়াছেন, গল্পটির সামান্যভাবই তাঁর রূঢ় বর্ণনায় যথার্থ্য প্রমাণ করিয়া দিতেছে। আমাদিগের স্পষ্ট বোধ হইতেছে, গ্রন্থকারের যদি কিছু মিথ্যা যোগ করিবার ইচ্ছা থাকিত, তিনি নানা প্রকার অলঙ্কার দিয়া গল্পটিকে সুশোভিত করিয়া তুলিতেন।"

১৫. মীর মশাররফ হোসেনের অপ্রকাশিত আত্মজীবনী, পৃ. ১২৭-২৮। আবুল আহসান চৌধুরীর 'মীর মশাররফ হোসেন : সাহিত্যকর্ম ও সমাজচিন্তা' গ্রন্থে উদ্ধৃত।

ও দর্শকের শ্রান্তি-বিমোচনে এই গানগুলো বিশেষ সহায়ক হয়েছে। এই নাটকের দুটি পর্ব : প্রথমত হায়ওয়ান আলী কর্তৃক কুলবধূ নূরুন্নেহারকে সম্ভোগের বাসনা, তার সতীত্বনাশ ও পরিণামে মৃত্যু এবং দ্বিতীয়ত অপরাধী জমিদারের বিচার-প্রহসন, অব্যাহতি-লাভ ও ফরিয়াদি আবু মোল্লার প্রতি প্রতিশোধগ্রহণ। প্রকৃতপক্ষে নূরুন্নেহারের মৃত্যুতে নাট্যিক ঘটনার পরিসমাপ্তি হয়েছে, পরবর্তী অংশ কেবল বিচারের প্রহসন ও বিচার-ব্যবস্থার ত্রুটি নির্দেশের জন্যই পরিকল্পিত। এই অংশটুকু 'প্রস্তাবনা'য় সূত্রধার-কথিত নক্‌শারই প্রতিফলিত রূপ।

'বসন্তকুমারী নাটকে'র মতো 'জমীদর দর্পণ' নাটকের চরিত্রগুলোও যথাযথ বিকাশলাভ করেনি। প্রায় সব চরিত্রই 'টাইপ'। এরা যেনো নাট্যকারের ইচ্ছা-পূরণের কুশীলব, ছকে-কাটা সীমাবদ্ধ ভূমিকা পালন করেই অন্তর্হিত হয়েছে। এর ভেতরে হায়ওয়ান আলী ও নূরুন্নেহারই কেবল ব্যতিক্রম। নিম্নস্তরের পাত্র-পাত্রীর মধ্যে জিতু মোল্লা, হরিদাস বৈরাগী, কৃষ্ণমণি ও গ্রাম্য চাষা আচরণ ও ভাষায় মৌলিক উজ্জ্বলতা নিয়ে স্বমহিমায় উপস্থিত।

'জমীদার দর্পণ' নাটকের ভাষা-বৈশিষ্ট্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই নাটকেই মশাররফ হোসেন ভাষা-ব্যবহারে তাঁর চরম সাফল্য প্রদর্শন করেছেন। আদালতের দৃশ্যের সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া এই নাটকের ভাষা কথ্যরীতির এবং তা চরিত্রের বা ঘটনার প্রকৃতি অনুসারে রচিত। পূর্ববর্তী 'বসন্তকুমারী নাটকে'র তুলনায় 'জমীদার দর্পণে'র ভাষা সহজ, প্রসঙ্গানুগ ও কথ্যরীতি-নিয়ন্ত্রিত।

'জমীদার দর্পণ' নাটকে চরিত্রের শ্রেণী-অবস্থান, সামাজিক মর্যাদা ও মানস-প্রবণতা প্রতিফলনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভঙ্গি ও রীতি ব্যবহৃত হয়েছে। এই নাটকে ব্যবহৃত ভাষার ত্রিবিধ শ্রেণীকরণ সম্ভব : ক. উচ্চ অভিজাত ও সহযোগী মধ্যশ্রেণী, খ. গ্রামীণ রায়ত-প্রজা, পাইক-বরকন্দাজ প্রভৃতি নিম্নশ্রেণী, গ. ইংরেজ জজ-ম্যাজিস্ট্রেট-ডাক্তার। সংলাপ-রচনার ক্ষেত্রে মশাররফ সবসময়ই পাত্র-পাত্রীর শ্রেণীগত পরিচয় ও সামাজিক অবস্থানের বিষয়টি বিবেচনায় এনেছেন। নিম্নশ্রেণীর চরিত্র চিত্রণে মশাররফ যথেষ্ট পরিমাণে আঞ্চলিক উপভাষার সাহায্য নিয়েছেন। অত্যন্ত সার্থকতার সঙ্গে কুষ্টিয়া-ফরিদপুর এলাকার আঞ্চলিক বুলি তিনি ব্যবহার করেছেন। তাঁর ব্যবহৃত আরবি-ফারসি-উর্দৃ-হিন্দি-ইংরেজি শব্দের সংখ্যাও কম নয়। প্রবাদ-

প্রবচনের বহুল ব্যবহার এই নাটকেও লক্ষ্য করা যায়। উত্তরকালে 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী'তে ব্যক্তি ও স্থানের ব্যঙ্গাত্মক নামের যে সমাহার তার সূচনা 'জমীদার দর্পণ' নাটকে।

প্রজাবিদ্রোহে ইন্ধন জোগাতে পারে এমন আশঙ্কায় বঙ্কিমচন্দ্র এই নাটকের প্রচার অনুমোদন না করলেও 'জমীদার দর্পণে'র ভাষার বিশেষ প্রশংসা করেন। তাঁর বিবেচনায় এই নাটকটি 'বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষায় প্রণীত' এবং এর বিশেষ গুণ এই যে, 'মুসলমানী বাঙ্গালার চিহ্নমাত্র ইহাতে নাই'। সর্বোপরি এর ভাষা সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের সিদ্ধান্ত, "অনেক হিন্দুর প্রণীত বাঙ্গালার অপেক্ষা, এই মুসলমান লেখকের বাঙ্গালা পরিশুদ্ধ।"[১৬]

'নীলদর্পণে'র মতো 'জমীদার দর্পণে'রও ঐতিহাসিক মূল্য আছে। এই নাটকটিও বিষয়-গুণে ও কালের প্রভাবে গণচেতনার স্বাক্ষর হতে পেরেছিল।[১৭] এই নাটকের প্রকৃত মূল্য সমাজচিত্র অঙ্কনে ও সামাজিক আবেদনে। বৃটিশ-শাসনের এক গুরুত্বপূর্ণকালে সামন্তশোষণের স্বরূপ, অসহায় রায়ত-প্রজার দুরবস্থা, স্বার্থতাড়িত ধর্মধ্বজী মানুষের মুখোশ ও আচরণ, বিচার-ব্যবস্থার ত্রুটি-দুর্নীতি এবং অত্যাচার-অবিচারমোচনে রাজশক্তির প্রতি নির্ভরতা ও প্রতিকার প্রার্থনার চিত্র এখানে রূপায়িত। ফলে 'জমীদার দর্পণ' নাটকটি যুগ-চিত্রের দলিল হিসেবে মর্যাদা লাভ করেছে।

৪.

'এর উপায় কি?' (১৮৭৫) মশাররফ হোসেনের প্রথম প্রহসন ও তৃতীয় নাট্যরচনা। এটি একাঙ্কভুক্ত চারটি দৃশ্য-সংবলিত প্রহসন। দৃশ্য এখানে 'রঙ্গভূমি' নামে চিহ্নিত। পূর্ববর্তী নাটক দুটিতে সংস্কৃত-রীতির নান্দী-প্রস্তাবনা সংযুক্ত হলেও এই প্রহসনটি সেই প্রভাবমুক্ত। এই প্রহসনে ছয়টি গান আছে। চরিত্রের বৈশিষ্ট্য-নির্দেশ এবং কাহিনীর সরসতা ও গতিময়তার জন্য এই গানগুলোর সংযোজন। সুরাসক্তি ও বারবণিতা-গমনের উনিশ শতকীয় একটি

---

১৬. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, *রত্নবতী থেকে অগ্নিবীণা—সমকালের দর্পণে*, ঢাকা, ১৩৯৮, পৃ. ১৩৮

১৭. কোকা আন্তোনভা, গ্রিগোরি বোনগার্দ-লেভিন ও গ্রিগোরি কতোভস্কি প্রণীত 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' (প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৮২, পৃ. ৪৮২) গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়,—"পাবনার অভ্যুত্থানের সময় ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দে মীর মশাররফ হোসেন 'জমিদার দর্পণ' নাটকটিতে জমিদারি অত্যাচারের উপর পর্যাপ্ত আলোকপাত করেছিলেন। গ্রাম-গ্রামান্তরে রায়তদের মধ্যে বৈপ্লবিক দষ্টিভঙ্গি প্রসারের সহায়ক হয়েছিল।"

বিশেষ সামাজিক সমস্যাকে কেন্দ্র করে প্রহসনটি রচিত। উনিশ শতকের সামাজিক ইতিহাসে এ-ধরনের অনাচার ও চরিত্রভ্রষ্টতার বিবরণ ও কাহিনী অপ্রচুর নয়। মশাররফের জীবনেতিহাসও এ-বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়। সমাজদেহ থেকে এই ব্যাধি নির্মূলের জন্য দু-ধরনের প্রয়াস সে সময় অবলম্বিত হয়েছিল : এক. সভা-সমিতির মাধ্যমে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষে সামাজিক আন্দোলন, দুই. নক্শা-নাটক-প্রহসন রচনার ভেতর দিয়ে এইসব কু-অভ্যাসের নিরাকরণ। এই সামাজিক অনাচারকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠে রঙ্গ-ব্যঙ্গের এক বিশাল সাহিত্যভাণ্ডার।[১৮]

সুরাপান ও গণিকা-সংসর্গ উনিশ শতকের বাংলায় বিষম সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি করেছিল। এতে দাম্পত্যজীবন বিড়ম্বিত ও পারিবারিক জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। 'এর উপায় কি?' প্রহসন এই সমস্যারই কৌতুকতর রূপায়ণ। রাধাকান্ত শিক্ষিত বিত্তবান শহুরে 'বাবু'। মুক্তকেশী তার স্ত্রী-সুন্দরী ও সুশীলা। রাধাকান্ত মদ্যপ এবং গণিকালয়ে নয়নতারা-নাম্নী এক অবিদ্যার কাছে তার নিত্য যাওয়া-আসা। স্ত্রীর প্রতি রাধাকান্তের যে-কেবল অবহেলাই আছে তা নয়, তাকে পীড়ন-অপমান করতেও তার দ্বিধা নেই। অসহায়া মুক্তকেশীর এই বিড়ম্বিত দাম্পত্যজীবনে ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় তারই প্রিয় সখী রাইমণি। মূলত এই সখীর কৌশলেই রাধাকান্তের বোধোদয় হয়। গভীর আত্মগ্লানি ও অনুশোচনায় জর্জরিত রাধাকান্ত তার ত্রুটি সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। অতঃপর রাধাকান্ত-মুক্তকেশীর বিড়ম্বিত দাম্পত্যজীবন নব-অনুরাগে সিক্ত হয়। মূলত এই কাহিনী অনাচারী ভ্রষ্টচরিত্র গণিকাসক্ত রাধাকান্তের গৃহে প্রত্যাবর্তনেরই কাহিনী। এই কাহিনী নির্ধারিত পরিণতি-নির্দেশক বলেই অনেকাংশে তা বৈচিত্র্যহীন।

এ প্রহসনে চরিত্রের আধিক্য নেই। পুরুষ-চরিত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রাধাকান্ত ও মদনবাবু। এ-ছাড়া আছে সন্ন্যাসীদাস, জগা ও হাকিম নগেন্দ্র বাবু। নারীচরিত্র তিনটি– নয়নতারা, মুক্তকেশী ও রাইমণি। পুরুষ-চরিত্রের মধ্যে রাধাকান্তই প্রধান। তাকে কেন্দ্র করেই এই প্রহসনের ঘটনাপ্রবাহ আবর্তিত। উনিশ শতকের ভোগলিপ্সু স্খলিত চরিত্র 'বাবু'র প্রতীক সে। অপরপক্ষে নয়নতারা এই প্রহসনের প্রধান নারীচরিত্র। সে পেশাদার

---

১৮. মীর মশাররফ হোসেন, 'এর উপায় কি?', চট্টগ্রাম, ১৩৮১, আনিসুজ্জামান সম্পাদিত, পৃ. ৩-৫ ('ভূমিকা')।

রূপোপজীবী। গণিকা-স্বভাবের সব বৈশিষ্ট্যই তার মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। মুক্তকেশী চরিত্রটিও উল্লেখযোগ্য। প্রণয় ও প্রতিবাদের দ্বৈতসত্তায় প্রাণিত মুক্তকেশী চরিত্রে রূপান্তর আছে।

'এর উপায় কি?' প্রহসনে কথ্য ভাষারীতির ব্যবহার মশাররফের পূর্বের দুটি নাটকের তুলনায় অধিকতর স্পষ্ট ও পরিণত। মশাররফের এই রচনাতেও প্রবাদ-প্রবচন, উপমা-অনুপ্রাসের সার্থক ব্যবহার আছে। 'মাছ ধর্ত্তে গেলেই গায়ে কাদা লাগে', 'ফেটে চৌচির হয়ো না', 'আসে লক্ষ্মী যায় বালাই', 'খুরে নমস্কার' ইত্যাদি প্রবচন পুরাতন এবং বহুল ব্যবহৃত হলেও এর যথার্থ ও প্রাসঙ্গিক প্রয়োগের ফলে এগুলো বিশেষ তাৎপর্য পেয়েছে। অনুপ্রাসের ব্যবহার বক্তব্যকে যেমন সরস ও বিষয়মুখী করেছে তেমনি ভাষাকেও প্রাঞ্জল করেছে।

'এর উপায় কি?' প্রহসন সম্বন্ধে অশ্লীলতা ও রুচিবিকারের অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছিল। বন্ধুর নামে প্রদত্ত প্রথম সংস্করণের উৎসর্গপত্র পরবর্তীতে প্রত্যাহারের এটাই প্রধান কারণ। 'বান্ধব' (আশ্বিন ১২৮৩) পত্রিকায় প্রকাশিত সমালোচনায় এই প্রহসনে 'অশ্লীল পদাবলীর ছড়াছড়ি' এবং 'কল্পনায় ও ভাষায় যারপরনাই জঘন্য রুচির' নিন্দা করা হয়।[১৯] সমালোচকের এই অভিযোগ অসত্য নয়। তবে এই অশ্লীল বক্তব্য, রুচিহীন বর্ণনা ও অশিষ্ট শব্দ ব্যবহারের যুক্তি হিসেবে এইটুকু কেবল বলা যায় যে, পতিতালয়ের আবহ এবং এই নিষিদ্ধ পল্লীর সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের ভাষা বা আচরণের স্বাভাবিকত্বই এতে প্রকাশিত হয়েছে। মূলত বাস্তবতাবোধের প্রয়োজনেই এগুলো ব্যবহৃত হয়েছে।

শিল্পমূল্যে ন্যূন হলেও উনিশ শতকের বাঙালিসমাজে সুরা ও বারবনিতা-সংসর্গে চরিত্রহীনতা ও রুচিবিকার নিরাকরণের মহৎ অভিপ্রায়ে রচিত এই প্রহসনটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য সেই প্রেক্ষাপটেই বিচার্য।

৫.

মনসার ভাসান বা বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনী বাংলার জনপ্রিয় লোকপুরাণ। সম্প্রদায়-নির্বিশেষে বাঙালি সমাজে এই কাহিনীর সমাদর। মশাররফ এই

---

১৯. *রত্নবতী থেকে অগ্নিবীণা–সমকালের দর্পণে*, পৃ. ১৩৯

কাহিনীকেই তাঁর 'বেহুলা গীতাভিনয়ে'র উপজীব্য করেন। কাহিনীগত বিষয়ে মৌলিকত্ব নেই, তবে উপস্থাপন-কৌশল ও কাহিনীর রূপায়ণ লেখকের নিজস্ব শিল্পচিন্তার ফসল।

'বেহুলা গীতাভিনয়' গদ্য-পদ্য-গীতসংবলিত লৌকিক নাট্যধারার অন্তর্ভুক্ত একটি রচনা। দেশীয় যাত্রাপালার সঙ্গে এর যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। ছয় অঙ্কে বিভক্ত এই গীতাভিনয়ের মোট দৃশ্য-সংখ্যা কুড়ি। দৃশ্য অভিহিত হয়েছে 'গর্ভাঙ্ক' হিসেবে।

বেহুলা-লখিন্দরের এই ছকে বাঁধা কাহিনীর চরিত্রসমূহের বৈশিষ্ট্য ও পরিণতি নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট। তাই চরিত্র-চিত্রণে লেখকের মৌলিক বা নৈপুণ্য প্রকাশের সুযোগ এখানে নেই বললেই চলে। প্রবীণ-অপ্রবীণ অনেক চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে এই গীতাভিনয়ে। চাঁদ সওদাগর ও বেহুলা এই কাহিনীর কেন্দ্রীয় চরিত্র। এ-ছাড়া লখিন্দর, চন্দ্রকেতু, সায়া বণিক, চূড়ামণি ঘটক, গোঁসাই দাস ঠাকুর, সনকা, মনসা, নেত ধোপানী প্রমুখের নাম উল্লেখ করতে হয়। মাঝি-মাল্লা, দেব-দেবতা, চাকর-নফর—এই ধরনের চরিত্রের সংখ্যাও কম নয়।

গীতবহুল 'বেহুলা গীতাভিনয়ে'র সংলাপে গদ্য-পদ্যের মিশ্র ব্যবহার আছে। গদ্যের পাশাপাশি পয়ার, ত্রিপদী ও ছড়ার ছন্দে রচিত পদ্যও সংলাপের মাধ্যম হয়েছে। এই গীতাভিনয়ের নিতান্তই সাদা-মাটা ও নিরাভরণ ভাষায় কোনো উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য নেই। তবে নিম্নশ্রেণী ও পেশার মানুষের কথোপকথনে ভাষা চরিত্রানুগ হয়েছে, এ-কথা বলা যায়।

'বেহুলা গীতাভিনয়' মশাররফ হোসেনের অকিঞ্চিৎকর রচনা। কাহিনী লেখকের উদ্ভাবিত নয় বলে এতে কল্পনার বিস্তার সম্ভব হয়নি, নির্দিষ্ট ছকের ভেতরেই তাঁকে আবদ্ধ থাকতে হয়েছে। উল্লেখযোগ্য শিল্প-বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষরও নেই এখানে।

মশাররফ হোসেন যে গ্রামীণ গল্প-কথা ও লোকসংস্কৃতির অনুরাগী ছিলেন তার নিদর্শন 'বেহুলা গীতাভিনয়'। হিন্দু-লোকপুরাণের এই কাহিনী নির্বাচনে লেখকের অসাম্প্রদায়িক পরিচয়ও পাওয়া যায়।

৬.

মশাররফের অনেক রচনাতেই সমাজসচেনতার পরিচয় আছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাস্তব পরিবেশকেই তিনি সাহিত্যের উপজীব্য করেছেন। তাঁর 'টালা-অভিনয়' এইরকম সমকালীন বাস্তব ঘটনা অবলম্বনে রচিত প্রহসন।[২০]

হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা 'টালা-অভিনয়ে'র কাহিনীর মূল বিষয়।[২১] আদালতের ডিক্রি পাওয়ার পর কলকাতার টালা-অঞ্চলে একখণ্ড জমির দখল নিতে গেলে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদের সূত্রপাত হয়। জমিটি ছিলো কলকাতার পাথুরিয়াঘাটার জমিদার মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের (১৮৩১-১৯০৮)। এই জমির উপর স্থানীয় মুসলমানেরা একটি চালাঘর নির্মাণ করে তা মসজিদ হিসেবে গণ্য করার চেষ্টা চালায়। কিন্তু আদালতের রায়ে তাদের এই দাবি নাকচ হয়ে যায়। আদালতের সাহায্যে মহারাজার লোকজন দখল নিতে গেলে ১৮৯৭ সালের ৩০ জুন প্রবল দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হয়। এর জের পরদিন অর্থাৎ ১ জুলাই পর্যন্ত চলে। সরকারি হিসেবমতে দাঙ্গায় পুলিশের গুলিতে ১১ জন নিহত ও প্রায় ২০ জন আহত হয়। অবশ্য নিহত ও আহতের প্রকৃত সংখ্যা এরচেয়ে বেশি ছিলো বলেই অনুমান। এই হাঙ্গামা কলকাতায় বিশেষ ভীতি ও সন্ত্রাসের সৃষ্টি করে এবং উত্তেজনাকর পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটায়। দাঙ্গা-হাঙ্গামাকারীদের ৮৭ জনকে গ্রেফতার করা হয় এবং বিচারে এরমধ্যে ৮১ জনের শাস্তি হয়। দাঙ্গা প্রথমে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে শুরু হলেও, শেষ পর্যন্ত তা এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, ছড়িয়ে পড়েছিল কলকাতাবাসী ইউরোপিয়দের মধ্যেও। পুলিশের গুলিবর্ষণ ও আইনরক্ষাকারী সংস্থা দাঙ্গাকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ায় এই বিবাদ কিছুটা ইংরেজ বনাম মুসলমানে রূপ নেয়।

---

২০. টালা-হাঙ্গামা প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য :

ক. *Calcutta Review*, October 1897, pp. 391-94

খ. C.E., Buckland, *Bengal under the Lieutenant Governors*, 2nd Vol. Calcutta, 1902, 2nd ed., pp. 1004-05

গ. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ৩য় খণ্ড, কলকাতা, ১৩৮১, দ্বি-স, পৃ. ৭৫-৭৮

ঘ. Sufia Ahmed, *Muslim Community in B[illegible]l*, Dacca, [illegible]74, pp. 201-02

২১. বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্র. আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত 'টালা-অভিনয়' প্রহসনের (কুষ্টিয়া, ১৯৭৯) ভূমিকাংশ (পৃ. নয়-তেইশ)।

টালা হাঙ্গামার জন্য মুসলমান সম্প্রদায়ের দায়িত্বই ছিলো বেশি। ঘটনাপ্রবাহ এবং নেতৃবৃন্দের প্রচারপত্রও এই ধারণা সমর্থন করে। টালা-ঘটনায় মশাররফ হোসেন বিশেষ বিচারবুদ্ধি ও নিরপেক্ষতার পরিচয় দেন। এই ঘটনায় স্বজাতি-স্বধর্মীদের প্রতি আবেগবশত কোনো অন্যায় সমর্থন বা সহানুভূতি তিনি দেখাতে চাননি। বরঞ্চ ঘটনার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য আবিষ্কার করে তার যথার্থ মূল্যায়ন করতে পেরেছিলেন।

মশাররফ হোসেনের অন্তরে হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি-ইচ্ছা ও অসাম্প্রদায়িক-চেতনার শেষ স্বাক্ষর এই 'টালা-অভিনয়' প্রহসনটি। 'টালা-অভিনয়' মশাররফ হোসেনের মানস-পরিবর্তনের অন্তিম পর্যায়ের রচনা। এর কিছুকাল পরেই 'গাজী মিঁয়ার বস্তানী'তে (১৮৯৯) এই পরিবর্তন স্পষ্ট রূপ নিয়ে উপস্থিত। হিন্দু-মুসলমানের মিলনে মৌলবি ও পুরোহিতের প্রচেষ্টা ও ইচ্ছা যে আন্তরিক ছিলো না শুধু তাই নয়, তাদের চক্রান্ত ও উস্কানিই যে এই দাঙ্গার মূল কারণ, প্রহসনে এই সত্যই প্রতিফলিত হয়েছে।[২২] এখানে হিন্দু-মুসলমান মিলনের কৃত্রিম ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রচেষ্টাকে মশাররফ বিদ্রূপ করেছেন। মৌলবি ও বিদ্যারত্ন যে উভয়েই কপট, তাদের মিলনের আকাঙ্ক্ষা যে আন্তরিক নয়, মশাররফ হোসেন তা বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। ইংরেজ বা রাজনীতি প্রসঙ্গে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিও এখানে লক্ষণীয়। মশাররফ জানতেন, জমির দখল প্রতিষ্ঠার জন্য কথিত চালাঘরটিকে মসজিদ প্রমাণের চেষ্টা করা হয়। তিনি আরো লক্ষ্য করেছেন, সমাজের উচ্চ বিত্তের খাঁ সাহেব–রাজাসাহেবেরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যেই হা-অন্ন দরিদ্র নিচুতলার মানুষকে ধর্মের নামে উত্তেজিত করে দাঙ্গা বাধায়। পরিণামে ক্ষতিগ্রস্ত হয় নিম্নস্তরের মানুষগুলোই।

মশাররফ বেশ কয়েকটি প্রহসন রচনা করলেও, ইতোপূর্বে কেবল 'এর উপায় কি?' (১৮৭৫)-এর সন্ধানই মাত্র মিলেছে। এর তুলনায় প্রহসন হিসেবে 'টালা-অভিনয়' শিল্পমূল্যে বিশিষ্ট নয়। শেষোক্ত প্রহসনের গঠনরীতি কোন প্রচলিত নিয়ম মেনে চলেনি। অঙ্ক ও দৃশ্যভাগও সংজ্ঞাসূত্র বহির্ভূত। 'টালা-অভিনয়' রচনাটি গল্প বা উপন্যাসের মতো ঢালাওভাবে লিখিত, পাত্র-পাত্রীর পরিচয় উল্লেখপূর্বক নাটকের সংলাপ-বর্ণনার রীতিতে সজ্জিত নয়।

মশাররফ হোসেনের এই প্রহসনটির চরিত্রগুলো পূর্ণাবয়ব নয়, ছায়ামাত্র এবং উদ্দেশ্য-সংলগ্ন হয়েই তাদের আবির্ভাব। মোটামুটি তিন শ্রেণীর চরিত্রের

---

২২. সৈয়দ মুর্তাজা আলী, *প্রবন্ধ-বিচিত্রা*, ঢাকা, ১৩৭৪, পৃ. ৮৯

সাক্ষাৎ পাওয়া যায় : ক. মৌলবি, বিদ্যারত্ন, শয়তান-সভার ভূতপ্রেত চেলা-চামুন্ডা, খ. নজু-ফজু-কালুর মতো খেটে খাওয়া নিম্নশ্রেণীর মানুষ, গ. খাঁ সাহেবের মতো উদ্দেশ্যতাড়িত কৌশলী মানুষ, আদালতের নাজির বাবু ইত্যাদি। যেহেতু প্রহসনটির পরিসর অতি সংক্ষিপ্ত, তাই কোন চরিত্রেরই ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠেনি। এক-দুজনকে বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসেবে চিনে নেওয়া যায়। মৌলবি বা বিদ্যারত্ন উভয়েই ধান্ধাবাজ, ধড়িবাজ স্বল্প পরিসরে সেই পরিচয় গুপ্ত থাকেনি। আপন উদ্দেশ্যের প্রতি বিশ্বস্ত শয়তান-সভার ভূতপ্রেত চেলা-চামুন্ডারা সংক্ষিপ্ত কথাবার্তার ভেতর দিয়ে বেশ উজ্জ্বল। তবে নজু-ফজু-কালুর মতো নিম্নশ্রেণীর চরিত্রগুলো সামান্য রঙের রেখায় হলেও বেশি উজ্জ্বল হয়ে ফুটেছে। খাঁ সাহেবের সংলাপে বোঝা যায়, উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে কৌশল অবলম্বনে সে সিদ্ধহস্ত। তবু চরিত্রগুলো পূর্ণ নয়, রেখা-ইঙ্গিত মাত্র।

ভাষা-ভঙ্গি অর্থাৎ সংলাপ-প্রয়োগের ক্ষেত্রে মিশ্র-রীতির ব্যবহার লক্ষণীয়। সাধু ও চলিত ক্রিয়াপদের গুরুচণ্ডালী প্রয়োগও আছে এখানে। বানান অশুদ্ধির দৃষ্টান্ত প্রচুর। সবক্ষেত্রেই সেগুলো মুদ্রণপ্রমাদ বলে সিদ্ধান্ত করবার কারণ নেই। মাঝে-মধ্যে আরবি-উর্দু শব্দের প্রাসঙ্গিক প্রয়োগ সরসতা এনেছে।

মশাররফ হোসেন 'টালা-অভিনয়' প্রহসনটি শিল্প-গৌরব নয়, সমকালীন একটি চাঞ্চল্যকর ঘটনার বিশ্বস্ত রূপায়ণের কারণেই গুরুত্বপূর্ণ। প্রহসনটি বক্তব্যে যতোখানি মূল্য বহন করে, শিল্পকর্মে ততোটুকু সমৃদ্ধ নয়। তাঁর পূর্বের প্রহসন 'এর উপায় কি'–এর সঙ্গে তুলনা করলেও এই রচনাটির দুর্বলতা ও অসম্পূর্ণতা চোখে পড়বে। সমকালের একটি বিশেষ ঘটনাকে মশাররফ শৈল্পিক-নির্লিপ্ততায় বিচার করে তার নিরপেক্ষ সাহিত্যায়নের চেষ্টা করেছেন, এখানেই তাঁর কৃতিত্ব। তাই বলা যায়, সাহিত্যিক উৎকর্ষে নয়, সামাজিক ও ঐতিহাসিক নিরিখেই এর যথার্থ মূল্য।

৭.

মশাররফের প্রথম নাটক 'বসন্তকুমারী নাটক' (১৮৭৩) ব্যতীত আর সব নাটকের কাহিনীই সমাজ-সংলগ্ন। তাঁর নাটকে সমাজ-বাস্তবতা ও সমকালীন ঘটনা প্রধান অনুষঙ্গ হয়েছে। 'জমীদার দর্পণ' (১৮৭৩), 'এর উপায় কি' (১৮৭৫) ও 'টালা-অভিনয়' (১৮৯৭) এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। উৎপীড়ন, শোষণ ও অবিচারে জর্জরিত রায়ত-প্রজার প্রতি তাঁর গভীর মনোযোগ, মমতা ও

সহানুভূতি 'জমীদার দর্পণ' নাটকে প্রতিফলিত। অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি ও নিম্ন কোটির শ্রমজীবী মানুষের প্রতি তাঁর অনুরাগ-পক্ষপাত প্রকাশিত 'টালা-অভিনয়' প্রহসনে। উনিশ শতকের শহুরে বাঙালি 'বাবু'দের অনাচার ও নৈতিক অধঃপতন যে কোন্ পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল, তার স্বাক্ষর আছে বাংলার সামাজিক ইতিহাসের পাতায়। সেই অনাচারের প্রধান উপকরণ ছিলো সুরাপান ও গণিকাগমন। মশাররফের প্রহসন 'এর উপায় কি?' চরিত্র-দোষের এই বিষয় অবলম্বন করেই রচিত। আবহমান বাংলার মানুষের স্মৃতি-শ্রুতিতে মনসা-পুরাণের কাহিনী চির-উজ্জ্বল। মশাররফ বেহুলা-লখিন্দরের এই জনপ্রিয় লোকপুরাণ নিয়ে রচনা করেন 'বেহুলা গীতাভিনয়' (১৮৮৯)। 'আমার জীবনী'-সূত্রে জানা যায়, মশাররফ আশৈশব লোক-ঐতিহ্য ও লোকসংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত। 'বেহুলা গীতাভিনয়ে'র মতো লৌকিক কাহিনীর নাট্য-রূপায়ণের মূলে রয়েছে লোকসংস্কৃতির প্রেরণা ও প্রভাব। এই নাটকেও সূক্ষ্ম সমাজচেতনার স্বাক্ষর আছে, বৃটিশ শাসনের কুফলের ইঙ্গিত আছে। এসব কারণে, বাংলা নাটকের সমাজ-বাস্তবতাবোধের ধারায় মীর মশাররফ হোসেনের অবদান স্মরণীয় হয়ে আছে।